***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 97-106*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# ত্রিপুরার নির্বাচিত লেখিকাদের গল্প : মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-সমস্যা ও যুগযন্ত্রণার আলেখ্য

**টিটন রুদ্র পাল**
*গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়*

***Abstract***

*In modern life middle class people have been destroyed drastically by the adverse effect of Global warming. The category of social status where they belongs has made their life miserable and complexed. They are neither rich nor poor. They do have their desire or dream, but do have the ability to fulfil it into reality. The middle class people belongs to the barrier of differences between desire and capability. This picture of their life style is porfrayed in short stories of Bengali literature. Young female writers of North-Eastern hilly state Tripura have expressed this wretched life style of middle class people in their short stories. Side by side the real picture of their day to day grievances has also been depicted in their short stories in a very realistic way.*

***Key Word: Global warming, Middle class, life complexed, Short story, Women Writers, Tripura.***

মানুষের সমাজে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণি বিভাজন রয়েছে। এই স্তর ও শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। সাধারণত উৎপাদন পদ্ধতি থেকে শ্রেণির বিকাশ হয়। আবার প্রত্যেকটি শ্রেণির একটি স্বতন্ত্র মর্যাদাবোধ গড়ে ওঠে। আর এই অর্থনৈতিক সঙ্গতি এবং মর্যাদাবোধই শ্রেণি বিচারের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জীবন ছিল গ্রামীণ, ভূমিকেন্দ্রিক। তখনকার সমাজের শ্রেণি বিচারের অন্যতম মাপকাঠি সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন,

> *"বংশ ও জমির মালিকানা দিয়ে শ্রেণি বিচার করা হত। সমাজ ছিল পরিবর্তনবিমুখ, স্থিতিশীল।"*[১]

আধুনিককালে এই জাতীয় সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। সৃষ্টি হয় নতুন নতুন শ্রেণির। বিশেষত ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। আর তখন থেকেই বিত্তের নিরিখে সমাজে নানা শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। শাসনকার্য পরিচালনার স্বার্থে ইংরেজরা ১৭৯৩ সালে যে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নীতি চালু করে তা থেকেই সমাজে উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত আর বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব। যদিও ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সমাজ বিত্তের নিরিখে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত এই বিশেষ শ্রেণিটির উদ্ভব এই সময়েই হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন,

> *"১৭৯৩ সালে বলবৎ হয় ভূমিরাজস্ব আদায়ের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই আধুনিক বাংলার সমাজের ভিত্তি বা 'infrastructure' হয়ে ওঠে। এর সঙ্গেই সূচনা হয় মধ্যবিত্তের উত্থানের যুগ।"*[২]

এদেশের আধুনিক কালের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের কেন্দ্রস্থিত ঘটনাটি হল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব। 'মধ্যবিত্ত' এই শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, এই সামাজিক শ্রেণিটি সমাজ বিন্যাসের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করে।

অর্থাৎ এর উপরে একটি এবং এর নিচে আর একটি স্তর--মধ্যবর্তী রেখায় এদের অবস্থান। সাধারণত এই শ্রেণির মানুষের বিত্তের পরিমাণ মাঝারি ধরনের--এদের অধিক বিত্ত নেই, আবার এরা একেবারে বিত্তহীনও নয়। এদের উপরে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণি যেমন রয়েছে তেমনি এদের নিচে রয়েছে কৃষক, শ্রমিক ও নানা ধরণের কারিগর শ্রেণির লোকেরা। এই দুই শ্রেণি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হল মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

মধ্যবিত্তদের জীবনে প্রধান সমস্যার সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক সঙ্কট। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য, অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও হতাশা ইত্যাদি নানা যুগযন্ত্রণা তাদের জীবনকে আরও জটিল করে তোলে। প্রধানত বিশ শতকের গোড়া থেকে এই আর্থিক দুর্দশা শুরু হয়। আর এই আর্থিক দুর্দশায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই সমস্ত সামাজিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের কথা সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছোটোগল্পেও এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। ত্রিপুরার কয়েকজন মহিলা গল্পকার তাঁদের গল্পের ভিত তৈরি করেছেন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের নানা জটিল সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তাঁদের গল্পের বিষয় বৈচিত্রের মধ্যে এটি একটি বিশেষ দিক। আসলে বিশ্বায়নের করাল গ্রাসে চারিদিকে যে সংশয়, দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তার ছোবল থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোটো পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরাও রেহাই পায়নি। পরিবর্তিত সমাজ জীবনের অভিঘাতের ফলে এরাজ্যেও অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও হতাশা যেভাবে মানুষের জীবনযাত্রায় নিত্য সমস্যার সৃষ্টি করছে তারই বাস্তব চিত্র এখানকার লেখিকারা তাঁদের গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

**মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-সমস্যা :**

মধ্যবিত্ত মানুষের অন্যতম জীবিকা হল চাকুরি। কারণ মধ্যবিত্ত বলতে সাধারণত মধ্য বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং নানা ধরনের কর্মচারীদের বোঝায়। এই কর্মচারীদের যে জীবনশৈলী তা তাদেরকে এই শ্রেণিতে দাঁড় করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন,

> *"...যাঁদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মধ্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার ও বিচিত্র রকমের শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সব কর্মচারী।"*[৩]

মধ্যবিত্তদের যেন একই ছকে বাঁধা জীবন। সকালে ঘুম থেকে উঠে অফিসের জন্য তৈরি হওয়ার তোড়জোড় এবং সন্ধ্যায় ফেরার সময় সংসারের জন্য বাজার করে নিয়ে আসা। এই ধরাবাঁধা জীবনে অল্পসময়ের জন্য বিলাসিতা করার অবকাশ তাদের হয়ে উঠে না। লেখিকা গৌরী বর্মণের 'হোক্ না ভিখিরি, মা...' গল্পে এই মধ্যবিত্ত জীবনচর্চার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র উঠে এসেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র মনোময় একজন চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্র। স্ত্রী স্বাগতাকে নিয়ে তার ছোটো সংসার। তার ছকে বাঁধা জীবনে অল্প সময়ের জন্যও বিলাসিতার কোনো পরিসর নেই। এমনকি কর্মব্যস্ত জীবনে অনেক সময়ই ঠিকমতো খাওয়ার সময়ও পায় না। আলোচ্য গল্পে তার এই দৈনন্দিন জীবনচর্চার চিত্র বর্ণিত হয়েছে এইভাবে,

> *"মধ্যবিত্ত ছাপোষা চাকুরিজীবির বিলাসিতা কি? ... ঘরের লাগোয়া ছোটো সব্জি বাগানে সময় কাটানো মনোময়ের মহান বিলাসিতা। বাগানে বসে একান্ত আলাপচারিতায় নৌকা ভাসায় মনোময়। ... বিলাসিতায় ভেসে মাঝে মাঝে মনোময় অফিসের কাজে দেরী করে ফেলে।"*[৪]

মধ্যবিত্ত মানসিকতার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় লেখিকা শুভ্রা সাহার 'নিমন্ত্রণ' নামক গল্পটিতে। উক্ত গল্পে দেখা যায় অনিল প্রথমে জুট মিলে কেরানির চাকুরি করতো। কিন্তু টাকার অভাবে সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে সে মিলের মধ্যে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। আর এর পরিণামে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু এই অপমানের কথা সে কাউকে বলেনি, এমনকি নিজের স্ত্রীকেও না। পাছে সকলে বুঝতে পারে যে তার চাকুরিটা আর নেই, তাই সে প্রতিদিন সময় মতো অফিস যাওয়ার নাম করে স্নান করে খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সমাজ এবং

পারিপার্শ্বিক সকলের অজান্তেই শহরে গিয়ে সে দিন মজুরের কাজ করতে থাকে। তার এই অভিনয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন,

> *"রোজ সকালে ভালো জামাকাপড় পরে বিয়েতে পাওয়া সাইকেল চেপে অফিসে যাচ্ছি বলে পারি দেয়। আর শহরে এসে ডেইলি লেবারের কাজে ঢুকে পরে।"*[৫]

শুধু তাই নয়, প্রতিদিনই আসার পথে বিনা নিমন্ত্রণে কোনো না কোনো বিয়ে বাড়ি থেকে খেয়ে এসে স্ত্রীর কাছে বড়াই করে বলে যে অফিসের সহকর্মীর বিয়ে থেকে খেয়ে এসেছে। একদিন স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে ছোটো ছেলেকে নিয়ে চুপিসারে বিনানিমন্ত্রণে বিয়ে বাড়িতে খেতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। এমনকি সকলের সামনে তার আসল পরিচয় প্রকাশ পায় যে সে কোনো চাকুরি করে না বরং বর্তমানে সে ডেইলি লেবারের কাজ করে। পুত্রের সামনে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ পাওয়ায় এবং সকলের সামনে এভাবে নাজেহাল হওয়ায় সে হতভম্ব হয়ে যায়। রাতের এই ঘটনা শুধুমাত্র তার স্ত্রীই নয় গ্রামের সকলেই জেনে যায়। ফলে তার সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়। গল্পে এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এইভাবে,

> *"ছেলের কাছে সব শুনে বৌ কান্না জুড়ে দেয়। গ্রামে পাঁচ কান হতেও দেরী হয় না। অপমানে বৌ ছেলে মেয়ে বড় দুটিকে রেখে ছোট দুটিকে নিয়ে অভয় নগর বাপের বাড়ীতে চলে যায়। অনিলের সংসারে অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকে। গ্রামের মানুষ অনিলকে ধিক্কার দেয়।"*[৬]

আসলে প্রথমে চাকুরিচ্যুত হয়ে অনিল দিশেহারা হয়ে পরে। তার মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আঘাত লাগে যে চাকুরি না করে শ্রমিকের কাজ করলে সমাজে তার মান কমে যাবে। আর এই মান রাখার চেষ্টায় সে একের পর এক মিথ্যা কথা বলে। আর এই মিথ্যার পরিণতি হিসাবে তার সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মধ্যবিত্তদের প্রধান সমস্যাই হল অর্থের অভাব। অর্থের অভাবের কারণেই তারা অনেক সময় নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে না। এই অপূর্ণ স্বপ্নকেই তারা পরবর্তীতে নিজেদের সন্তানের মধ্য দিয়ে পূরণ করতে চায়। 'জীবনের পথে' নামক গল্পেও এই চিত্র লক্ষ করা যায়। উক্ত গল্পে আমরা দেখি নির্মল উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেনি। তাই সে পরিকল্পনা করে যে মেয়েকে ডাক্তার আর ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবে। তার এই পরিকল্পনার কথা আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে এইভাবে,

> *"নির্মলের ইচ্ছা মেয়েটাকে ডাক্তারী পড়াবে। এখন তো আর ডাক্তারী পড়াতে ত্রিপুরার বাইরে পাঠাতে হবে না? তাই খরচও কম হবে। নির্মলের মত যারা মধ্যবিত্ত পরিবার রয়েছে ওদের ছেলেমেয়েদের স্বপ্নও পুরণ হবে। ... মেয়েটাকে একটা লাইনে ফেলে তারপর ছেলেটাকে ধরব। ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে দেবো। এখন এভাবেই চলুক। আমার তো জীবনে কিছু হল না। দেখি ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু করতে পারি কিনা।"*[৭]

আবার অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে মধ্যবিত্তরা নিজের স্বাদ আহ্লাদ পূরণ করতে পারে না। তাদের ইচ্ছা থাকলেও কোনো কিছু ক্রয় করার সময় বার বার নিজের পকেটের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। ঠিক এই রকমই একটি দৃশ্য লক্ষ করা যায় লেখিকা গৌরী বর্মণের 'ইসক্ কী দুনিয়া মেঁ নো এন্ট্রি' নামক গল্পে। উক্ত গল্পে দেখা যায় প্রণব আর অঞ্জনা একে অপরকে ভালোবাসে। উভয়ে সংসার করার স্বপ্ন দেখে। তারা প্রাইভেট স্কুল আর কলেজে পড়িয়ে অল্প-বিস্তর আয় করে। অর্থনৈতিক চাহিদায় তারা প্রাইভেট পড়ায়। এমনি করে কোনোরকমে চলতে থাকলেও কখনো কখনো অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে তাদের স্বাদ-আহ্লাদকেও বিসর্জন দিতে হয়। গল্পে দেখা যায় অঞ্জনা সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক সরঞ্জাম নিতে থাকে শপিং সেন্টার থেকে। তার ধারণা টাকার দরকার হলে প্রণবের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। কিন্তু প্রণব যখন জানায় যে তার পকেটও খালি তখন অঞ্জনার মন খারাপ হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই করুণ দৃশ্যটি আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে এইভাবে,

*"তাকগুলোর সামনে ঘোরাফেরা করছে অঞ্জনা। ... জিনিস দেখাতেই থামছে না, উল্টেপাল্টে দাম, ওজন সবেতেই নজর করছে। হাতে একটা বাস্কেট ধরে আছে। প্রণব ভালো করে খেয়াল করলো একটা দু'টো করে বাস্কেটের পেটে জিনিস ঢোকাচ্ছে অঞ্জনা। ... এদিক ওদিক তাকিয়ে অঞ্জনার একদম পিছনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে নাক চুলকাতে চুলকাতে প্রণব বলছে। তুমি তো শপিং ইসকে্র দুনিয়াতে হারিয়ে গেছো। আমাকে বাইকটা এক্ষুনি গ্যারেজ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে। তাই পকেট। অঞ্জনার হাত থেমে গেলো তাকে। বাস্কেটটা প্রণবের হাতে দিলো। এবারে পার্সের চেনটা টানলো। ভালো করে দেখলো ভেতরটা, টেনেমেনে দু'শো হবে। ... অঞ্জনা নিরুত্তর। বাস্কেটটা নিয়ে আবার জায়গার জিনিস জায়গায় রাখলো। শুধু একটা হরলিক্স, বিস্কিট আর রুম ফ্রেশনার নিলো। মিলিয়ে দেখলো আবার পার্সের সাথে।"*[৮]

আসলে প্রণবের মতো মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রে মানিয়ে চলতে হয়। তাদের নিজের সামর্থের সঙ্গে নিজের স্বাদ-আহ্লাদকে অনেক সময়ই আপস করে নিতে হয়। এই আপস করার প্রবণতা মধ্যবিত্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। মধ্যবিত্তদের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন,

*"মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসিকতা থেকে 'আপস'সর্বস্ব এই বৈশিষ্ট্যকে বাদ দেওয়া যাবে না।"*[৯]

তাছাড়া আধুনিক যুগ পরিবর্তন মধ্যবিত্ত সমাজ মানসিকতায় সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছে। কারণ মধ্যবিত্তদের প্রধান যে অর্থনৈতিক সমস্যা তা আরো ঘনীভূত হয়ে পড়ে পরিবর্তিত সমাজ কাঠামোয়।

মধ্যবিত্ত পরিবারে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এমনভাবেই থাকে যে তারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মনের স্বাদ-আহ্লাদ পূরণ করার কোনো সুযোগই পায় না। তবুও তারা সহজে নিরাশ হয় না, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। লেখিকা পদ্মশ্রী মজুমদারের 'মধ্যবিত্ত' গল্পেও এই চিত্র লক্ষ করা যায়। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র অর্পিতা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। সে দেখতো প্রতিদিন তার বাবা বাজার করে এসে সন্ধ্যার সময় সমস্ত দিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব করতেন। এরপর যে খুচরো পয়সা থাকতো সেগুলি তার মা মাটির লক্ষ্মী-ঝাঁপির মধ্যে জমিয়ে রাখতেন। অর্পিতা যখন তার মাকে জিজ্ঞাস করে যে এগুলি জমিয়ে কি করা হবে তখন তার মা জানান টাকা জমলে একটা বাঁধানো শাঁখা করবেন। কিন্তু অর্পিতা তার মাকে বলে যে এটাতো তার বাবাকে বললেই এনে দিতে পারেন। এর প্রত্যুত্তরে তার মা তাকে যে কথাটা শুনিয়েছেন তার থেকেই মধ্যবিত্তদের প্রকৃত স্বরূপটি ফুটে উঠেছে,

*"আমরা তো মধ্যবিত্ত পরিবারের মা। আমাদের এভাবে পয়সা জমিয়েই জিনিস তৈরী করতে হয়।"*[১০]

কিন্তু অর্পিতা দেখেছে টাকা আর জমানো হয়ে ওঠে না। প্রতি বছরই হয়তো পরীক্ষার ফি নয়তো টিচারের ফি কিংবা মাসের শেষে হঠাৎ অতিথির আগমনে সেই টাকাও খরচ হয়ে যায়। আবার স্বপ্ন দেখা বাঁধানো শাঁখা পরার। কিন্তু অর্পিতা দেখেছে তার মায়ের সেই স্বপ্ন আর কোনোদিনই সত্যি হয়ে উঠেনি। কারণ ভাঙা-গড়ার এই খেলা চলাকালীন সময়ে একদিন তার বাবার মৃত্যু হয়। তাই অর্পিতা বড়ো হয়ে আর মধ্যবিত্তের বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে থাকতে চায় না। তার ইচ্ছা যেভাবেই হোক কোম্পানির প্রমোশন নিয়ে ফ্ল্যাট, গাড়ি কিনে আরাম-আয়াসে জীবন অতিবাহিত করা। কিন্তু প্রমোশন যখন সে পায়নি তখন আবার স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের। আসলে মধ্যবিত্তদের প্রধান অবলম্বনই স্বপ্ন। এই স্বপ্নের জোড়েই মধ্যবিত্তরা বেঁচে থাকে, ব্যর্থতার পরও আবার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা পায়। আলোচ্য গল্পে অর্পিতাও ব্যর্থতার পর যে স্বপ্নগুলি দেখে তার মধ্যদিয়ে মধ্যবিত্তদের প্রকৃত স্বরূপটি ফুটে উঠে,

*"- সামনের মাসে একটা পলিসি করব। সেই টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনব, ছবির মতো। তারপর ইনস্টলমেন্টে একটা মারুতি। ঝকঝকে, আমাদের টিভিটা পুরনো মডেলের, একটা নূতন মডেলের টিভি*

*কিনব। আর একটা ওয়াশিং মেশিন। ... একের পর এক ইনস্টলমেন্টে কেনা স্বপ্নদের ভিড়ে মধ্যবিত্ত হতে থাকে অর্পিতা।"*[১১]

আধুনিক পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় যারা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে তাদেরই সমাজ আধুনিক বলে থাকে, আর যারা তাল মেলাতে পারে না তাদের প্রাচীনপন্থী বলে থাকে। এই তাল মেলাতে গিয়ে অনেক সময় নিজেদের আদর্শ, এমনকি আত্মসম্মান পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়। আর এই জায়গায় সৃষ্টি হয় মানুষের সঙ্গে পরিবর্তিত সময়ের প্রধান দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সবচেয়ে বেশি জর্জরিত হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা। কারণ তারা না পারে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে, আবার না পারে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় নিজেদের আত্মসম্মান টিকিয়ে রাখতে। ঠিক এই রকম একটি চিত্র উঠে এসেছে পদ্মশ্রী মজুমদারের 'পাগল' নামক গল্পটিতে। আলোচ্য গল্পে দেখাযায় মৃগাঙ্ক আর তনয়ার সংসার কায়ক্লেশে কোনোরকম ভাবে চলে। মৃগাঙ্ক যে অফিসে চাকরি করে সেখানে অন্যরা অনেক উপরি টাকা আয় করে। কিন্তু মৃগাঙ্ক সে পথে টাকা আয় করতে নারাজ। কারণ এতে তার বিবেকে বাঁধে। আর এই কারণেই অফিসের সকলে তাকে পাগল বলে ডাকে। এমনকি তার নিজের স্ত্রী তনয়াও তাকে পাগল বলতে কুণ্ঠা বোধ করে না। তনয়ার ইচ্ছা তারা আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরাম-আয়াসে চলবে, তাদের ছেলেকে পয়সা খরচ করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াবে। কিন্তু মৃগাঙ্কের স্বল্প আয়ের চাকরির টাকায় সেসব আর তেমনভাবে হয়ে ওঠে না। তাইতো তনয়া মৃগাঙ্ককে, তার আদর্শকে অবজ্ঞা করে বলে,

*"কি যে এক পাগলের ঘর করছি। ... সবাই ঘুষ খাচ্ছে, তিনি খান না। এদিকে যে ঘরে একটা ভালো সোফা নেই, কালার টিভি নেই, ফ্রীজ নেই, সেদিকে কোনো হুঁশ আছে! ... লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, ... ভেবেছিলাম উপরি তো থাকবেই। এখন দেখছি সব ফাঁকা। মাসের প্রথম দিকে কিছু বাঁধাধরা টাকা। তা দিয়ে সংসার সামলাতে হিমশিম খাচ্ছি।"*[১২]

স্বামী মৃগাঙ্কের এই স্বল্প আয় দিয়ে তনয়ার মন ভরেনি বলে সে কিছু আয় করার জন্য বিপথে পা দেয়। আর এর পরিণতি হিসাবে গল্পে দেখা যায় অবশেষে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত হয়ে যায়। আসলে অর্থনৈতিক চাপ যখন মধ্যবিত্ত পরিবারে বেশি পড়ে তখন অনেক ক্ষেত্রেই চারিত্রিক অবনতি ঘটে এবং চিরায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সংকট দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন,

*"অর্থনৈতিক চাপ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে মধ্যবিত্তের উপর। ফলত, যেনতেনভাবে অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য মধ্যবিত্তের দিনাতিপাত। চরম স্বার্থপরতা, নির্বিকার ভাব, নির্লিপ্ততা—এগুলি মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির আশু উল্লেখযোগ্য সংকট।"*[১৩]

মধ্যবিত্তদের আরেকটি প্রধান সমস্যা হল তারা অনেক ক্ষেত্রেই আয়ের তুলনায় ব্যায়ের হিসাব মেলাতে জানে না। ফলে জীবনে সামঞ্জস্যের অভাবে তাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পদ্মশ্রী মজুমদারের 'নেড়িকুকুর' গল্পে দেখা যায় জনৈক ব্যক্তি সরকারি অফিসের একজন স্বল্প আয়ের কর্মী। কিন্তু তিনি সন্তানকে সাধ্যাতিরিক্তভাবে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে চান। তার কারণ প্রতিবেশীর সন্তান যেহেতু ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে সেহেতু নিজের সন্তানকেও সেখানে পড়াতে হবে। আর এর ফলেই সৃষ্টি হয় নানা সমস্যার। নিজেদের আভিজাত্য বজায় রাখতে গিয়ে মধ্যবিত্তদের জীবনে যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয় তারই বাস্তবসম্মত বর্ণনা আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে এইভাবে,

*"বাচ্চাকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছি, খরচ আছে না ! আজ এই ফি, কাল ঐ ফি। ... ইংলিশ মিডিয়ামের খরচটা সামলিয়ে ওঠা দায়। গৃহিণীকে কত করে বললুম পড়ুক না বাংলা মিডিয়ামে, কি আছে। না, হবে*

*না। পাশের বাড়ির ইঞ্জিনিয়ারের বাচ্চা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে, অতএব পড়াতেই হবে। - এই সোনার হরিণ ধরতে ধরতেই তো জীবনটা গেল। এই রোজগার, তার উপর স্ট্যাটাস মেনটেন।"*[১৪]

মধ্যবিত্তদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোবাসনা কীভাবে তাদের জীবনকে বিষিয়ে তোলে তারই বাস্তবসম্মত বর্ণনা ফুটে উঠেছে লেখিকা সিক্তা চক্রবর্তীর লেখা 'সেতু' গল্পগ্রন্থের 'ক্ষত' নামক গল্পে। উক্ত গল্পে আমরা দেখি সামান্য ক্লার্কের চাকরি করে সুপ্রিয় সংসারের যাবতীয় খরচ চালাতে হিমশিম খায়। কিন্তু তার স্ত্রী সুদেষ্ণা সমাজে আর সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের একমাত্র কন্যাকে নাচে গানে নানা কিছুতে পারদর্শী করে তুলতে চায়। আর এই ইঁদুর দৌড়ে পাল্লা দিতে গিয়ে সংসারের যে বেহাল দশা হয়ে পড়ছে সেদিকে সুদেষ্ণার নজর ছিল না। কিন্তু সুপ্রিয় উপলব্ধি করে ছোটোবেলা থেকেই মধ্যবিত্ত পরিবারে বড়ো হতে গিয়ে অর্থনৈতিক যে টানাপোড়েন লক্ষ করে এসেছে তা থেকে আজও সে বেরোতে পারেনি। তাকে যেমন মাসের শেষে কারো না কারোর কাছে হাত পাততে হচ্ছে ঠিক একই দৃশ্য দেখেছে তার বাবার ক্ষেত্রেও। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ধরনের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের চিত্র আলোচ্য গল্পে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে,

*"প্রতি মাসেই কারো না কারোর কাছে হাত পাততে হচ্ছে। বাবাকেও দেখেছে ওদের পরীক্ষার ফি-র জন্য লোকের কাছে হাত পাততে। চোখের সামনে বাবার মুখটা ভেসে ওঠে। - সুবু, তুই পইড়া বড় হ। তাহলেই আমার আর কোনো কষ্ট থাকত না। রাতদিন খাটতে হত তাকে।"*[১৫]

মধ্যবিত্ত পরিবারের এই দৃশ্য যেন সর্বকালের। আর এই আগামী দিনের ভালো কিছুর স্বপ্নে বেঁচে থাকার দৃশ্যটাও যেন চিরন্তন সত্য মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে।

লেখিকা মঞ্জু দাসের লেখা 'ছড়ানো বীজ প্রান্তরে' নামক গল্পগ্রন্থের 'বেনামা সময়ে' গল্পে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-সমস্যা এবং যুগযন্ত্রণার কথা। এই গল্পে আমরা দেখি নন্দিতা আর সুকান্তের সংসারে আয়ের পরিমাণ তেমন বেশি না। একা হাতে সুকান্ত যা রোজগার করে তা থেকেই সংসারের নানা খাতে খুব হিসেব করে খরচ করতে হয়। দৈনন্দিন বাজার, ছেলের পড়াশোনার খরচ, নিজেদের ঔষধপত্রের খরচ ইত্যাদি চালিয়ে সংসার যেন খুব কায়ক্লেশে চলে। আর এই ধরাবাঁধা খরচের পর যদি অতিরিক্ত কোনো খরচ বেড়ে যায় কোনো মাসে তাহলেই যেন সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর তাই তো নন্দিতার মামাতো দেওর যখন তাদের জন্য তাল নিয়ে আসে পিঠে বানানোর জন্যে তখনই নন্দিতার চেহেরায় চিন্তার ভাঁজ দেখা দেয়। কারণ নন্দিতা জানে তালের পিঠে বানাতে যে সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তা তাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে যোগান দেওয়া খুবই কষ্টকর। ফলে তাদের সাধ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই সাধ্য হয়ে ওঠে না। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই অর্থনৈতিক সমস্যার কথা আলোচ্য গল্পে নন্দিতার কথার মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে,

*"নন্দিতা ভাবে তালের পিঠেতো এমনি এমনি হবে না। জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে একজনের রোজগারে সংসার চালানোই দায় হয়ে উঠেছে। মাসে মাসে ছেলেকে টাকা পাঠাতে হয়। নিজের জন্যও মাসকাবারে কতগুলো টাকা বরাদ্দ করে রাখতে হয়।"*[১৬]

আসলে মধ্যবিত্তরা ধরাবাঁধা জীবনের বাইরে ইচ্ছে থাকলেও চলতে পারে না। তাদের প্রতি পদে পদেই চিন্তা করে পা ফেলতে হয়। আর এই হিসেবি জীবন-যাপন মধ্যবিত্তদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

লেখিকা নিয়তি রায়বর্মণের লেখা 'গল্প হলেও সত্যি' নামক গল্পগ্রন্থের 'শিউলির ইচ্ছা অনিচ্ছা' গল্পে ফুটে উঠেছে মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার কথা। এই গল্পে আমরা দেখি শিবেন্দ্র আর হৈমন্তীর সংসারে নিত্য অভাব লেগেই থাকে। কখনো সন্তানদের পড়াশুনার খরচ, আবার কখনো সংসারের যাবতীয় খরচ--এসবের জাঁতাকলে পড়ে হৈমন্তী নিজের শখ, আহ্লাদকে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। সমস্ত কিছুর মধ্যেই সে মানিয়ে নিতে শিখে গেছে। আর এই মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতাটা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে। কারণ

মধ্যবিত্তদের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের ফলে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর যেন ধীরে ধীরে হতাশার ঘন প্রলেপ পড়ে যায়, যা দূর করা তাদের সাধ্যের মধ্যে থাকে না। আলোচ্য গল্পে হৈমন্তীর ক্ষেত্রে এই কথাটি যে সমানভাবে বর্তায় তা গল্পে বর্ণিত এই অংশটি থেকে বোঝা যায়,

> *"যেদিকে তাকানো যায় শুধু অব্যবস্থা আর অব্যবস্থা। বাড়ির মানুষগুলি অভাব-অনটনের সঙ্গী করেই বেঁচে বর্তে আছে। ... হৈমন্তী সংসারের জোয়াল ঠেলে ঠেলে ক্লান্ত। কোনো প্রকার শখ আহ্লাদের কথা ভাবনায় আনতে অনভ্যস্ত হয়ে গেছে। সংসারের আর পাঁচজনের ভালো-ই তার ভালো আর মন্দয় তারও মন্দ। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রিতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত পরিবারের প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ মেটানোই তার কাজ। ... মানিয়ে নিতে পারার মতো সহজ পথ আর হতে পারে না – এ নীতিই হৈমন্তীর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছে। ... হৈমন্তী জীবনে ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে গৃহিনিদের ভূমিকা প্রায় একই রকম।"*[১৭]

এইভাবে ত্রিপুরার মহিলা রচিত বহুগল্পে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সমস্যার কথা বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। মধ্যবিত্তদের প্রধান সমস্যা হল বিত্তের সমস্যা। আর এই বিত্তের অভাবেই দোদুল্যমান দ্বিচারিতা, আপস তথা মানিয়ে চলার মানসিকতা, বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্য উক্ত গল্পগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

**যুগযন্ত্রণা :**

পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় মানুষের চিরায়ত জীবনশৈলীতে নানা আঘাত লাগার ফলে যে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয় তাকেই সাধারণত যুগযন্ত্রণা বলে ধরা হয়। এই যুগযন্ত্রণার প্রধান লক্ষণ হল বেকারত্ব, জীবিকার পরিবর্তন ইত্যাদি। আর এর চিত্র আমরা ত্রিপুরার মহিলা রচিত গল্পগুলিতে প্রতিফলিত হতে দেখি। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির ফলে যে যুগযন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে সে কথা আমরা লেখিকা জয়া গোয়ালার 'থাবা' গল্পে লক্ষ করে থাকি। এই গল্পে দেখা যায় সভ্যতার অগ্রগতিতে আরামপ্রিয় মানুষ ধীরে ধীরে যন্ত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর ফলে অতীতের জীবনধারার বহু পরিবর্তন ঘটে যায়। আলোচ্য গল্পে দেখা যায় বিদেশ থেকে উন্নতমানের সস্তার চা আমদানি হওয়ায় মানুষ দেশীয় চা কিনতে চাইছে না। ফলে ধীরে ধীরে চা বাগানগুলি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আর এর ফলে চা বাগানে কর্মরত বহু শ্রমিক তাদের কর্মসংস্থান হারাতে থাকে। আবার যন্ত্রসভ্যতার করালগ্রাসে ধীরে ধীরে ডাকঘরগুলি বন্ধ হতে থাকে। তাই ডাকঘরে কর্মরত শিবচরণ নিজে অস্তিত্বসংকটে পড়ে অনাগত ভবিষ্যতের থাবা থেকে বাঁচার জন্যে তার পালিত কুকুরকে পর্যন্ত চিঠি লিখতে বলে। কারণ চিঠির ব্যবহার হলেই ডাকঘরও থাকবে তার চাকুরিও থাকবে। আলোচ্য গল্পে যুগযন্ত্রণার এই চিত্র শিবচরণের মুখ দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে এইভাবে,

> *"শিবচরণ আঁতকেই ওঠে প্রায়--কিন্তু এরকমই তো শুনছে – একতাড়া কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হবে তাদের। লাল বাক্সোগুলো উধাও হয় যাবে। ...কি সব পি-সো বসছে। কম্প্যুটার আসছে। সব চটজলদি হয়ে যাবে যন্তরে, ফুস মন্তরে – চিঠির কি দরকার। ... শেরুকে বলে, ফিসফিসিয়ে বলে – এই চিঠি লেখ, বুজজসনি? তরা চিঠি লেখলেই তো পোষ্টাফিস খোলা, ঠিক না?"*[১৮]

লেখিকা সিক্তা চক্রবর্তীর 'সেতু' গল্পগ্রন্থের 'ফাটল' গল্পে আমরা দেখি পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় কীভাবে একটি পরিবারের বাঁচার সম্বল হারায় সেই চিত্র। এই গল্পের প্রধান চরিত্র জনার্দন প্রথমে সিনেমা হলের মেশিন চালিয়ে রোজগার করত। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের ঘরে টিভি চলে আসায় মানুষ এখন আর সিনেমা হলে আসে না। ফলে জনার্দনের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে আসে। এরূপ যুগযন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে জনার্দন জানায়,

*"কোন্ দিন যে বন্ধ হইয়া যাইব, আর তারপর যে কিতা করুম। পোলাপানডির একটা গতি কইরা গেলে বাঁচতাম। ঘরে বইয়া সিনেমা দেখলে মানুষে ক্যান হলে যাইব? ঐ বাক্সডায় সব শেষ করছে।"*[১৯]

জনার্দনের এই উক্তির মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় মানুষের অসহায়তার কথাই যেন পরিস্ফুট হয়েছে।

সমধারার একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম হল লেখিকা এন.জি. বিজয়লক্ষ্মী সিংহের 'অভিসারক'। এই গল্পে আমরা দেখি নীলমণি ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছেন তাঁর পূর্বপুরুষরা সকলেই মহারাস লীলার যাত্রা করতেন এবং অন্যদেরও শেখাতেন। ধীরে ধীরে তিনিও এই কাজে মনোনিবেশ করলেন। সারাটা বছর তিনি অপেক্ষা করে থাকেন শুধু এই দিনটার জন্য। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলেন বর্তমানে মানুষ পূর্বের মতো উৎসাহ নিয়ে আর যাত্রাপালা দেখে না। এমনকি তার নিজের পরিবারের কোনো সদস্যই পূর্বপুরুষের এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তৎপর নয়। কেউ এই পুরানো দিনের যাত্রাপালা দেখতেও চায় না এবং শেখারও আগ্রহ দেখায় না। সকলেই যেন আধুনিক সভ্যতার নানা জৌলুসে পুরানো সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে। পরিবর্তিত সময় ও সমাজের কাছে পুরনো সংস্কৃতি যেন আজ অবহেলিত।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বেকার সমস্যা। অগণিত বেকার ছেলেমেয়েরা আজ পড়াশোনা করে নিজের যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। ফলে তারা ছন্নছাড়া হয়ে পেটের দায়ে নানা বাঁকা পথে টাকা রোজগারের পথ খুঁজতে থাকে। ঠিক এই ধরনেরই একটি চিত্র দেখাযায় 'স্পন্দন' নামক ছোটোগল্পে। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র পল্লব উচ্চশিক্ষা লাভ করেও যখন কোনো কর্মসংস্থান পায়নি তখন নিজে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু সেই ব্যবসাও যখন ভাগ্যের বিড়ম্বনায় টিকলো না তখন সে হতাশায় ভোগতে থাকে। এমন সময় তার মায়ের শরীর এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে অপারেশনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অর্থের অভাবে সে দিশেহারা হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাচারকারীর দলে যোগ দেয়। পল্লবের স্ত্রী যখন তার এই অবনতি দেখতে পায় তখন সে তার স্ত্রীর উদ্দেশে বলে,

*"... বাচনের লেইগ্যা শেষ পর্যন্ত--এই পথটাই আমার কপালে আছল।"*[২০]

আসলে মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের প্রধান সমস্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। আর এই সমস্যা তাদের জীবনে অনেকসময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা তাদের দিশেহারা করে তুলে। ফলে উপায়ান্তর না দেখে তাদের এমন অনেক কাজ করতে হয় যা তারা করতে চায় না। কিন্তু যুগের অভিঘাত ও অবস্থার বিপাকে পড়ে তারা সে কাজ করতে বাধ্য হয়। মোটকথা তাদের জীবন-সংগ্রামটা যে কতটা ভয়ানক তার বাস্তব চিত্রই আলোচ্য গল্পে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

'তিমিরহননের গান আমার' গল্পেও ফুটে উঠেছে এধরনের যুগযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। এই গল্পের প্রধান চরিত্রও পড়াশুনা শেষ করে ভেবেছিল তার প্রেমিকা মল্লিকাকে বিয়ে করে সুখের সংসার করবে। কিন্তু বেকার বলে মল্লিকার সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি। পরবর্তীতে চাকরির জন্যে সে হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে। কিন্তু নেতারা চাকরির বিনিময়ে তার কাছে দশ লক্ষ টাকা দাবি করে। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হয়ে এতো টাকা সে দিতেও পারেনি আর চাকরিও তার হয়নি। সে বুঝতে পেরেছিল যে বর্তমান সমাজে সবকিছুই টাকার বিনিময়ে হয়। টাকা না থাকলে কিছুই লাভ করা যায় না। তাই সে তার পুরানো প্রেমিকা মল্লিকার কাছে ঋণ হিসাবে দশ লক্ষ টাকা চায়। সে ভেবেছে চাকরি হয়ে গেলে আস্তে আস্তে মল্লিকার টাকাটা ফিরিয়ে দেবে। সে সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এখন চাকরিটা হাসিল করতে চায়। মল্লিকার কাছে টাকা চাওয়ার সময় সে যে কথাগুলি বলেছে তা সত্যিই অভিনব এবং মর্মবিদারক। মল্লিকাকে সে বলে,

*"মলিকা, আমায় তুমি দশ লক্ষ টাকা দেবে? ধার হিসেবে? ... একটা চাকরি কিনব।"*[২১]

এই 'চাকরি কিনব' কথাটির মধ্যে যেন রয়েছে তার অন্তরের জমানো যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। আর এই যন্ত্রণা অবশ্যই বেকারত্বের যন্ত্রণা, যুগযন্ত্রণা।

এধরনের বেকার সমস্যার কথা লেখিকা মিতা রায়ের 'সূর্যোদয়', সোমা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নিহত স্বপ্নের কোলাজ', এন.জি.বিজয়লক্ষ্মী সিংহের 'রনজয়ের ডায়েরী থেকে', সীমা দাশের 'মল্লিকার্জুন', 'ভাঙ্গা মন', মীনাক্ষী সেনের 'কাপুরুষ', 'মাল্টিন্যাশনালের ছেলে', দোলা সেনের 'ইঁদুর দৌড়ের ট্র্যাকে', পদ্মশ্রী মজুমদারের 'ব্ল্যাকহোল' প্রভৃতি গল্পেও ফুটে উঠতে দেখি।

এভাবে দেখা যায় যে ত্রিপুরার মহিলা রচিত অনেক গল্পে একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে যুগযন্ত্রণার বাস্তবচিত্র রূপায়নেও সক্ষম হয়েছেন লেখিকারা। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল বেকার সমস্যা। যুবক-যুবতিরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেও যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থান খুঁজে পাচ্ছে না। তাছাড়া বিশ্বায়নের করাল গ্রাসে সর্বত্রই এক অর্থনৈতিক অচলাবস্থা পরিলক্ষিত হয়। আর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের উপর। কারণ ইচ্ছা আর সামর্থের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে, সেই টানাপোড়েনেই তারা প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হয়। মোটকথা অর্থনৈতিক অচলাবস্থা এই শ্রেণির লোকের জীবনে যে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে সেসব দিকই লেখিকারা তাঁদের গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

**তথ্যসূত্র :**


১। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক', অক্টোবর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা. ১৫৫
২। শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্মকথা—একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী(সম্পা.) 'বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস', জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা. ১০
৩। বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা'(১৮০০-১৯০০), অক্টোবর ২০০৯, পৃষ্ঠা. ১৭৫
৪। শঙ্কর বসু(সম্পা.), 'আরোহণ', শারদ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা. ১৮৫
৫। শুভ্রা সাহা, 'গোধূলির রবি', মানবী প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠা. ৪২
৬। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৫
৭। তদেব, পৃষ্ঠা. ৭৭
৮। স্নেহময় রায়চৌধুরী(সম্পা.), 'ত্রিবেণী', দ্বাবিংশতিতম বর্ষ, সপ্তদশ সংখ্যা, ২০০৭, পৃষ্ঠা. ৩১
৯। মল্লিকা ব্যানার্জি, মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসিকতা, খোকন কুমার নাগ ও রঙ্গনকান্তি জানা(সম্পা.), 'মধ্যবিত্ত বাঙালি : অন্তরমহল', জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা. ১০৯
১০। পদ্মশ্রী মজুমদার, 'জুম', স্রোত প্রকাশনী, কুমারঘাট, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, পৃষ্ঠা. ১৫
১১। তদেব, পৃষ্ঠা. ১৮
১২। তদেব, পৃষ্ঠা. ২১
১৩। প্রগতি মাইতি, মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি ও মধ্যবিত্তের সংকট, সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি (সম্পা.), 'বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস', জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা. ২০৯
১৪। পদ্মশ্রী মজুমদার, 'জুম', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৬
১৫। সিক্তা চক্রবর্তী, 'সেতু', ভাষা প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা. ১৭
১৬। মঞ্জু দাস, 'ছড়ানো বীজ প্রান্তরে', ডিসেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা. ১৩৫
১৭। নিয়তি রায়বর্মণ, 'গল্প হলেও সত্যি', অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা. ২৬
১৮। জয়া গোয়ালা, 'ছড়া জলের ছবি', বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা. ৬০

১৯। সিক্তা চক্রবর্তী, 'সেতু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৯

২০। সিক্তা চক্রবর্তী, 'অন্তিকা ও একটি রাত', অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা. ৩৫

২১। সোমা গঙ্গোপাধ্যায়, নিহত স্বপ্নের কোলাজ, ভাষা প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা. ৪০

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা'(বাংলা ছোটগল্পের একশ'বিশ বছর), দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৬

২। অমিতাভ সিনহা, 'ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক বিবর্তন অভিজ্ঞতার আলোকে', নব চন্দনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬

৩। ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, 'বিশ্বায়ন ও শ্রমব্যবস্থা', প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৩

৪। তপোধীর ভট্টাচার্য, 'ছোটোগল্পের বিনির্মাণ', আবহমান, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০২

৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে ছোটোগল্প, মিত্র ও ঘোষ, তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১২

৬। শিশিরকুমার দাশ, 'বাংলা ছোটগল্প', দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৭

৭। শিশির কুমার সিংহ। 'ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস', অক্ষর পাবলিকেশনস্, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৮

৮। শেখর দাস, 'গল্প নিয়ে', অক্ষর পাবলিকেশনস্, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪

৯। সুবোধ কুমার ঘোষ, 'বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক', প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৩